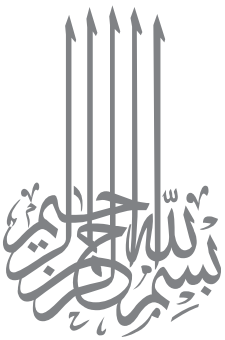

لا تدع سلَّة الخبزِ فارغة

سلوى شلة

রুটির ঝুড়ি রেখো না খালি

সালওয়া শাল্লাহ

রুটির ঝুড়ি রেখো না খালি

মূল

সালওয়া শাল্লাহ

ভাষান্তর

আব্দুল্লাহ মজুমদার

দারুলকারার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। জীবনের প্রতিটি পরতে ছড়িয়ে আছে তার অনুগ্রহের নমুনা। আল্লাহর অবারিত নিয়ামতের মাঝে অন্যতম একটি নিয়ামত ছিল কিশোরদের জন্য এই গল্পটি অনুবাদ করতে পারা। কিশোরদের জন্য বাজারে বইয়ের সংখ্যা অপ্রতুল। যে সমস্ত বইপত্র রয়েছে, সেগুলোতেও শিক্ষণীয় দিক-নির্দেশনার চাইতে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা কিংবা ভুল বার্তাও রয়েছে। বিষয়টি বিবেচনা করে কিশোরদের জন্য উপযুক্ত মনে করে বইটি বাছাই করি এবং ছোট বই হওয়ায় খুব দ্রুত অনুবাদ সমাপ্ত হয় ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

একজন মানুষ ছোটবেলা থেকে যে চিন্তা-আদর্শ লালন করে, বড় হয়ে সেটা তার কর্মে প্রতিফলিত হয়। ছোটবেলায় যদি তার লক্ষ্য স্থির ও নির্ধারিত না থাকে, তাহলে বড় হওয়ার পর তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণে বেগ পেতে হয়। জীবনের একটা পর্যায়ে এসে পূর্ব থেকে নির্ধারিত রূপরেখা না থাকায় আফসোসে পড়তে হয়। মুসলিম জীবনে ইহজীবনে সফলতার পাশাপাশি পরকালীন সফলতার লক্ষ্যকেও মাথায় রাখতে হয়। আর এমন লক্ষ্য একজন কিশোরের মনে ছোটবেলা থেকেই তৈরি থাকলে তার জন্য উভয় জগতে সফলতা পাওয়া সহজতর হয়ে যায়।

বইটির মূল লক্ষ্য হলো গল্পচ্ছলে কিশোরদেরকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। জীবনে পার্থিব অর্জনের চাইতে পারলৌকিক অর্জনের দিকে বেশি উদ্বুদ্ধ করে তোলা; পাশাপাশি মুসলিমদের প্রতি সহমর্মিতা এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সদাচরণ—সবই এই বইটির শিক্ষণীয় দিক। ধন্যবাদ জানাই প্রিয় বন্ধু শরীফুল ইসলামকে, যিনি বইটিতে চোখ

বুলিয়ে কিছু দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে শব্দ-প্রয়োগ ও বাক্যচয়নে নিজের বিদ্যার পর্যাপ্ত ঝুলি থেকে আমাকে উপকৃত করেছেন। সাথে কৃতজ্ঞতা থাকছে দারুল কারার পাবলিকেশন্সের আল-আমীন ভাইয়ের প্রতিও, যিনি বইটি ছাপানোর পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সময় দিয়ে ধন্য করেছেন।

সবশেষে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ, তিনি যেন এই কাজটুকুর মাধ্যমে কিশোরদের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কল্যাণকর প্রভাব তৈরি করেন। সাথে অনুবাদকের পক্ষ থেকে সামান্য আমল ও পরকালের পাথেয় হিসেবে কবুল করে নেন।

আল্লাহর করুণার ভিখারী
আব্দুল্লাহ মজুমদার
২৪ জুমাদাল আখিরাহ, ১৪৪৫ হিজরী সন

প্রথম অধ্যায়

‘মা, মা! একবারে আটটা খরগোশ হয়েছে! আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না! একটা ছোট পেট থেকে কীভাবে আটটা খরগোশ বের হলো?!

কয়েকটা সাদা খরগোশ। আর কয়েকটার রং ধূসর আর বাদামী। সবগুলো মায়ের পেটের দিকে চলে গেল। সেখান থেকে দুধপান করতে লাগল। মনে হয় যেন কত লম্বা একটা সময় ধরে তারা বিষয়টা জানে। আহ! যদি আমার সাথে দেখতে! একজন তার ভাইয়ের ঘাড়ের উপর চড়ে বসে দুধ পান করছে। মনে হয় যেন এটাই স্বাভাবিক। আরেকজন পা দুইটা উঁচু করে দুধ পান করছে। আরেকটা তো ঠিক মুখের মাঝখানে একটা লাথি খেয়ে নিজেকে ভাইদের থেকে দূরে এক জায়গায় দেখতে পেল। মায়ের কাছে আবার ফিরে আসার মতো শক্তি পাচ্ছে না। তাকে দেখে বেশ হাসি পাচ্ছে।’

‘বাহ, সুসংবাদ, আলহামদুলিল্লাহ! আমরা প্রথমবারের মতো খরগোশ পালছি। তোমার খুব ভালো লাগছে বোধ হয়!’

‘মেয়ে খরগোশ কিন্তু বছরে কয়েকবার সন্তান জন্ম দেয়, জানো নাকি?’

‘প্রত্যেকবারই আটটা করে?!’

‘কখনো এর চেয়ে বেশি, কখনো কম।’

‘এমন হলে তো আমি অনেক বড় সম্পদের অপেক্ষায় থাকব। তোমরা একটা খরগোশও খাবে না কিন্তু। সংখ্যায় অনেক বেশি হলে আমি ব্যবসায়ী হয়ে শহরের বাজারে খরগোশ বিক্রি করব আর টাকা উপার্জন করব।

ইয়াহু! মা, আমি কি এত সহজে ধনী হয়ে যেতে পারব?

আমার ব্যবসা জমজমাট হয়ে গেলে আমি একটা নতুন এনড্রয়েড মোবাইল কিনব। আমার এই পুরাতন মোবাইলে নতুন গেইমগুলো ডাউনলোড হয় না। চার্জ দেওয়ার জন্য আমাকে সবসময় দেয়ালের সাথে লেগে থাকতে হয়, মনে হয় যেন আমি দেয়ালেরই একটা অংশ। এই ফোনটা থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব! নতুন মোবাইল পেলে আমার ফ্রি ইন্টারনেটের জন্য দূরে যেতে হবে না, তখন আমার নিজেরই ইন্টারনেট থাকবে। আমার দামী জামা-কাপড় দেখলে বন্ধুরা ভীড় করবে। আমি সবচেয়ে বড় সুপারশপ থেকেই ফোনটা কিনব।’

‘আমিও খুশি হবো। তোমার স্বপ্ন পূরণ হলে তুমি তোমার অভিযোগ করা বন্ধ করবে। আমিও আর বিরক্ত হবো না।’

‘মা, জানো? আমি যে ফোনটা কিনব, সেটার ক্যামেরা খুব স্পষ্ট হতে হবে। কারণ আমি অন্য ছেলেদের মতো একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলব। সেখানে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলার সম্প্রচার করব। সেটা অনেক মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়বে। আমি বিখ্যাত হয়ে যাব। তখন তোমার ছেলেকে নিয়ে তুমি খুব গর্ব অনুভব করবে। কারণ তারা তোমার ছেলের ছবি নেওয়ার জন্য তাকে ঘিরে রাখবে। সে তাদেরকে মাঝে মাঝে সুযোগ দিবে, মাঝে মাঝে ফিরিয়ে দিবে! আমার জীবনের সব কষ্ট ঘুচে যাবে। আমি নিশ্চিত সুখী হবো!

কয়েক বছর ধরে খরগোশ যখন এভাবে অনবরত বৃদ্ধি পাবে তখন আমি অনেক বড় ব্যবসায়ী হবো। তারপর বড় ব্যবসায়ীদের মতো করে টিলার উপরে একটা বাড়ি করব।

ঐ যে একজন বড় ব্যবসায়ী আছে না, যিনি খালার টেক্সাসে যাওয়ার আগে বিপদে সাহায্য করেছিল? আমিও তার মতো ধনী এবং দানশীল হবো।

মা, খরগোশ বেড়ে গেলে কি এগুলো সব হয়ে যেতে পারে?'

'হতে পারে। যদি অধিকাংশ ছেলে খরগোশ না হয়। তুমি হয়তো সেটা ভেবে দেখনি।'

'মা, আমার মাথায় এই সম্ভাবনা আসার আগে আমাকে একটু সুখী চিন্তা করতে দাও। যদি অধিকাংশ ছেলে খরগোশ হয়, তাহলে আমি শেষ!'

'ভাবতে থাকো, আশাবাদী ভাবুক ছেলে আমার!'

উমর বসে বসে যখন টাকা জমানোর দিবাস্বপ্নে বিভোর, তখন পাশের গ্রামে সবাই চিৎকার চেঁচামেচি করছে,

'সাবধান! নদী উপচে পড়ছে, বাঁধ ভেঙে পড়ছে। চলো আমরা সবাই পালাই।'

উপত্যকাকে নদীর পানি থেকে রক্ষার জন্য যে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল, সেটা ভাঙতে বসেছে। এই নদীটা ছিল আশেপাশে থাকা ছোট ছোট শহরগুলোর কাছে শরীরের শিরা-উপশিরার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

একের পর এক শহর তছনছ করে চলল নদীর পানি। লাউয শহরে উমরের পরিবারের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল। উমরের পরিবার নিজেদের অজান্তেই শেষ মুহূর্তটুকু কাটাচ্ছিল তাদের বাড়িতে।

'মা, জানো! আমি যখন ধনী হয়ে যাব, তখন যে ছাত্ররা গরীব বলে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিল, তাদের প্রতিশোধ নিব। তাদেরকে এক টাকাও দিব না, যতই আমার কাছে কাকুতি-মিনতি করুক।

আমি গরিব বলে যারা আমার দিকে বাঁকা নজরে তাকাতো, তাদের সবার থেকে আমি প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব।'

'আমার মনে হয় না এটা খুব একটা ভালো কাজ হবে!'

'মা, আমার জন্য কি বাবা নতুন জামা-কাপড় এনেছে? আমার এই পুরাতন জামা আর ছেঁড়া জুতা নিয়ে ঠাট্টা মশকরা শুনতে শুনতে নিজেকেই আমার অপছন্দ হয়!'

'উমর, তোমার বাবা পারলে তোমাকে পুরো দুনিয়া এনে দিতে চায়। তোমার প্রতি তার যে ভালোবাসা, সেটার বিনিময়ে তুমি অল্প একটু সবর ধরো, শুকরিয়া আদায় করো!'

'সবর, সবর, সবর! আমি বাবাকে অনেক ভালোবাসি। কিন্তু আর কত সবর করব?!'

উমর অভিযোগ শেষ করার আগে তড়িঘড়ি করে বাবা ঘরে ঢুকল।

'বন্যায় সব ভেসে যাচ্ছে! এই কাঠটা নাও। শক্ত করে ধরো।'

'কী?! বন্যা?! বাবা, কী হয়েছে তোমার?'

'ভয় পেয়ো না। আমি ভালো থাকব। তোমার মাকে দেখে রেখো।'

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রবল বেগে তাদের ঘরে ঢুকে পড়ল বন্যার পানি। ঘর ভেঙে ঘরের লোকজন এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল।

'বাবা, মা! আমার খুব ভয় হচ্ছে!'

'উমর, ছেলে আমার! শক্ত করে ধরে রাখো।'

কাঠের টুকরোর মতো মানুষগুলো ভেসে গেল। প্রবল ঢেউ যেন কোনোভাবেই থামছে না। চোখের পলকে তিনজন আলাদা হয়ে গেল।

ঘর-বাড়ি, হাট-বাজার ভেসে গেল। মানুষ আর গাছপালা হারিয়ে গেল। জীবনের সকল চিহ্ন মুছে গেল। লাউয শহরের বড় একটা অংশ পানির নিচে চলে গেল। যে শহরটা এতদিন সবুজ উপত্যকার বুকে ছিল। লাউয শহরের লালচে ছাদগুলোর কারণে জায়গাটা বেশ সুন্দর লাগত। কিন্তু মুহূর্তের মাঝে সব অতীত হয়ে গেল।

বাড়ির ছাদগুলো বড় বড় নৌকার মতো প্রবাহিত হয়ে চলল। গাড়ি, গাছপালা, আসবাবপত্র সব মানুষের সাথে মিশে গেল। আক্রান্তের সংখ্যা অনবরত বাড়তে লাগল।

কয়েক ঘণ্টা পর।

'দাদাভাই, দ্রুত আসেন।'

'কী হলো, আদম?'

'এই ছেলেটাকে পেয়েছি। বন্যার স্রোতে সে ছিটকে এসে পাথরের উপর পড়েছে। আমি তাকে ঘোড়ায় করে এখানে নিয়ে এসেছি। সে এখনও বেঁচে আছে।'

'ও আল্লাহ! ছেলেটাকে বাঁচতে দিয়ে আমাদের ধন্য করো।'

'নেটওয়ার্ক বন্ধ। রাস্তাঘাট স্তূপে ছেয়ে যাওয়ায় অ্যাম্বুলেন্সগুলো শহরের দিকে যেতে দেরী করছে। দাদাভাই, কিছু করেন। ওকে বাঁচান। প্লিজ।'

'ওকে নিয়ে উনুনের কাছে আসো। শুকনা কিছু জামা-কাপড় আর একটা পুরু লেপ আনো। সে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে।'

'বিসমিল্লাহ।'

☆☆☆☆☆

উমর কয়েক ঘণ্টা পর চোখ মেলে তাকাল।

‘তোমরা কারা? আমি এখানে কেন?’

‘চিন্তা করো না, তুমি ভালো আছো। আমি আদম, এটা আমার দাদাভাই মাহফুয।’

‘আমার বাবা-মা কোথায়? তাদের ব্যাপারে তোমরা দুজন কিছু জানো?’

‘আমরা ওদেরকে ইন শা আল্লাহ পেয়ে যাব। ছেলে আমার, দুশ্চিন্তা করো না।’

‘ধন্যবাদ দাদা। আল্লাহ! আমার বাবা-মাকে নিরাপদে রাখুন। তাদেরকে আমার সাথে আবার একত্র করুন।’

‘আমাকে তোমার দাদা হিসেবে ‘দাদাভাই’ ডেকো। তোমার নামটা বললে না তো?’

‘আমি উমর।’

‘উমর, পুরো শহরটা ভেঙে পড়েছে। একটা বাড়িও নেই। মানুষজন কেউ হারিয়ে গেছে, কেউ ডুবে গেছে, কেউ অনেক দূরে চলে গেছে। আমাদের বাড়িটা যদি উপরে না থাকত, তাহলে আমরাও বাঁচতাম না।’

‘আপনাদের বাড়ি টিলার উপর? আমি কি সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ীর বাড়িতে?’

‘হ্যাঁ, তুমি তার বাড়িতে। ছেলে আমার, তোমাকে স্বাগতম।’

যে বাড়িটা এতদিন দূর থেকে দেখত উমর, সেটা এবার কাছ থেকে দেখল। ঠিক যেমনটা ভেবেছিল, বাড়িটা তেমনই। দামী আসবাবপত্র আর নরম খাট দেখলে বোঝা যায়, এই পরিবারটা বিত্তশালী।

টিলার উপরের বাড়িটা নিয়ে তার সবসময় কৌতূহল ছিল। কৃষকদের বাড়ির চাইতে জাঁকজমক আর ডিজাইনের কারণে আলাদা। সে সবসময় ভাবত তারা কেমন আরামে থাকে? তারা দিন-রাত কোন ধরনের প্রাচুর্যে বসবাস করে? জীবনটা যখনই সংকীর্ণ হয়ে আসত, তখন বাড়িটার কথা সে বেশি করে ভাবত। কল্পনার সাগরে ডুব দিয়ে স্বপ্নের বাড়ির ছবি আঁকত মনে মনে। এখানে নিশ্চয় জীবনটা খুব সুন্দর ও সুখময়। 'হ্যাঁ, এমন সুন্দর বাড়িতে শুধু সুখীরাই থাকে। এখানে কোনো দুঃখ, দুশ্চিন্তা, কষ্ট আর অস্বচ্ছলতার জায়গা নেই।' এমনটা সে ভাবত!

'তুমি নিশ্চয় ক্ষুধার্ত! কয়েক মিনিটের মধ্যে তোমার জন্য সুস্বাদু খাবার আসছে।'

'এই বাড়িতে খাদেমাও আছে। আহ! আদম, তুমি কত সৌভাগ্যবান।' মনে মনে ভাবল উমর।

কিছুক্ষণের মধ্যে তার সামনে খাবার হাজির। গোশত, ভাত, ফলমূল আর শাকসবজি। তার মনে হলো সে স্বপ্নে আছে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কতদিন সে অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু এমন সময়ে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো, যখন তার আনন্দের সুযোগ নেই!

সে কীভাবে আনন্দ করতে পারে, যেখানে সে বিপদে পড়ে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছে! কিছুক্ষণ আগে সে বাবা-মাকে হারিয়েছে, এখন কীভাবে সে ভোগ-বিলাসে ডুবে যেতে পারে!

দুঃসহ পরিস্থিতির তিক্ততা তার সুখ, স্বাদ ও আনন্দের অনুভূতি ভুলিয়ে দিল।

'আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আপনারা অনেক ভালো।'

'খাবার খেয়ে নাও। তোমার শরীর চাঙ্গা হয়ে যাবে।'

দাদার পীড়াপীড়িতে উমর কয়েক লোকমা খেয়ে শরীরে শক্তি ফিরে পেল। কান্নার দমকে নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছিল, তবু নিজেকে সংবরণ করে নিল সে।

এ সময়ে পাঁচ বছর বয়সের একটা ছোট মেয়ে ঘরে ঢুকল। মেয়েটার চোখ নীল। গাল গোলাপী বর্ণের।

'আমাদের কোনো অতিথি আছে নাকি?'

'দানা, এদিকে আসো। আমাদের এক নতুন বন্ধু আছে। তার নাম উমর। ওকে সালাম দাও।'

উমরের সাথে হাত মিলানোর জন্য দানা হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু এদিক-সেদিক হাত বাড়িয়ে উমরকে খুঁজে পাচ্ছিল না সে। উমর অবাক হয়ে তাকিয়ে বুঝল দানা অন্ধ। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিল, যাতে সে লজ্জা না পায়।

'দানা, আমি উমর। তোমাকে দেখে ভালো লাগল।'

'উমর, তুমি কি জানো? আমার একটা বাচ্চা ঘোড়া আছে। সেটার নাম দিয়েছি শাহবা। মাত্র দুই বছর বয়স। ঘোড়াটাকে আমি অনেক ভালোবাসি, ঘোড়াটাও আমাকে অনেক ভালোবাসে।'

'তোমার ঘোড়ার সাথে পরিচিত হলে খুশি হবো, সে নিশ্চয় তোমার মতোই সুন্দর।'

'হ্যাঁ, আমি পরিচিত করাব। চলো আমরা যাই।'

বন্যার দিন পেরিয়ে রাত এলো। উমরের বাবা-মায়ের কোনো খবর এলো না। উমরের মনে হতে লাগল, সে এই সুন্দর পরিবারের উপর চেপে বসা একটা বোঝার মতো। কিন্তু কোথায় যাবে বুঝতে পারল না সে।

‘আমি বাবার খোঁজে বের হবো। আপনাদের আপ্যায়নের জন্য ধন্যবাদ। আপনারা আমার যে উপকার করেছেন, তা আমি কখনো ভুলব না।’

‘ছেলে, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তোমার তো যাওয়ার জায়গা নেই। তোমার বাবা-মাকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত আমাদের সাথেই তুমি থাকো।’

‘আপনাদের উপর আমি বোঝা হয়ে যাচ্ছি এমন ভয় হচ্ছে। আমি নিজেই নিজের দেখভাল করতে পারব।’

‘না, কখনো না। তুমি আমাদের জন্য বোঝা না। আমার বাবা-মা প্যারিসে গেছে। তারা এক সপ্তাহ পর আসবে। তুমি আমার সাথে আমার রুমে থাকবে, উমর। আমি খুব খুশি হবো।’

‘না, আদম। তোমার সাথে থাকবে না। সে আমার রুমে থাকবে। আমার কাছে উমরকে ভালো লেগেছে। তাকে কাছে পেলে আমার মন প্রশান্তি পায়। আদম, তুমি তোমার বোনের দিকে নজর রাখবে।’

‘আচ্ছা, দাদাভাই। উমর আজকের জন্য শুধু আপনার কাছে। কালকে থেকে আমার কাছে থাকবে।’

‘আদম, তুমি তো ভালোই কথা শিখে গেছ। যাও, ঘুমাতে যাও।’

সবাই ঘুমাতে গেল। উমর দাদার রুমে গেল। রুমের জানালা দিয়ে লাউয গ্রামটা দেখা যায়। পূর্ণিমার চাঁদের আলোতে সে তার প্রিয় গ্রামটা দেখতে পেল। এক ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে গ্রামটা।

দাদার সাজানো বিছানায় গিয়ে সে চিৎ হয়ে হাঁটু দুইটা ভাঁজ করে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। নরম বিছানা আর পালকের বালিশে। সবসময় সে এমন বিছানাই তো চাইত। কাঁদতে কাঁদতে সে দুর্বল হয়ে গেল। মায়ের সাথে কাটানো সুন্দর মুহূর্তগুলো মনে পড়তে লাগল। মায়ের হাসি, নরম আচরণ, হাসি-ঠাট্টার দৃশ্যগুলো ভেসে উঠল।

স্মরণ হলো বাবার কথা, যিনি দিন-রাত কাজ করতেন। বাবা তাকে এত ভালো ভালো জিনিস দিতে চেষ্টা করত, তবু সে সবসময় বাবার দারিদ্র্য নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করত। পুরাতন ভাঙাচোরা হলেও তাদের বাড়িটা ছিল ভালোবাসা, করুণা আর বরকতে ভরপুর। বাড়ির ছোট ছোট খরগোশ আর ফুলের গাছের দৃশ্যও মনে আসল। নীরবে চোখ থেকে অশ্রু ঝরল তার। এভাবে ভাবতে ভাবতে একসময় সে গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

☆☆☆☆☆

‘এই ছেলে, উঠো। আমরা ফজরের নামায পড়ি। তারপর রুটির ফ্যাক্টরিতে যাব। অনেক ঘুমিয়েছ।’

‘শুভ সকাল, দাদাভাই। আপনি কি রুটির ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন?’

‘হ্যাঁ। চল আদমের সাথে ফ্যাক্টরিতে কাজ করো। কাজের মধ্যে বরকত আছে।’

‘আচ্ছা, দাদাভাই। আমি নিজেকে এখনি গুছিয়ে নিচ্ছি ইন শা আল্লাহ।’

বাড়ির পেছনে দাদার রুটির ফ্যাক্টরি খুঁজে পেল উমর।

‘আদম, কাজ শুরু করে দাও। বন্যা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাদরাসা বন্ধ। আমি জানি না তুমি আর উমর কীভাবে ক্লাস ফাইভে পড়া শেষ করবে। সে তো মনে হয় তোমার বয়সী।’

‘হ্যাঁ, আমিও ক্লাস ফাইভে পড়ি।’

‘চলো, কাজে লেগে পড়ি। বহু মানুষ রুটির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা বেশি পরিমাণে রুটি তৈরি করব। তারপর বিতরণ করব। আর উমরের বাবা-মাকেও খুঁজব।’